বিজ্ঞানানন্দ পত্রিকা

৪২ তম বর্ষ, সংখ্যা নং : ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩

মে, ২০১৬ এপ্রিল, ২০১৭

Testament on Salvation

অমৃতায়ন

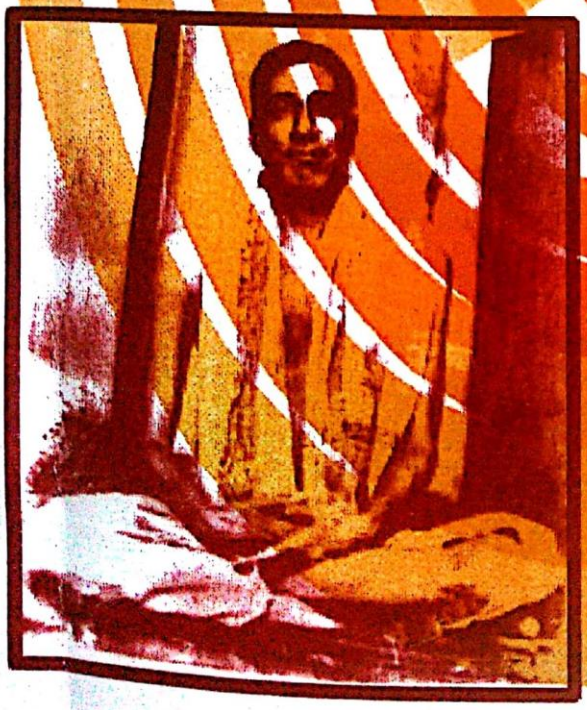

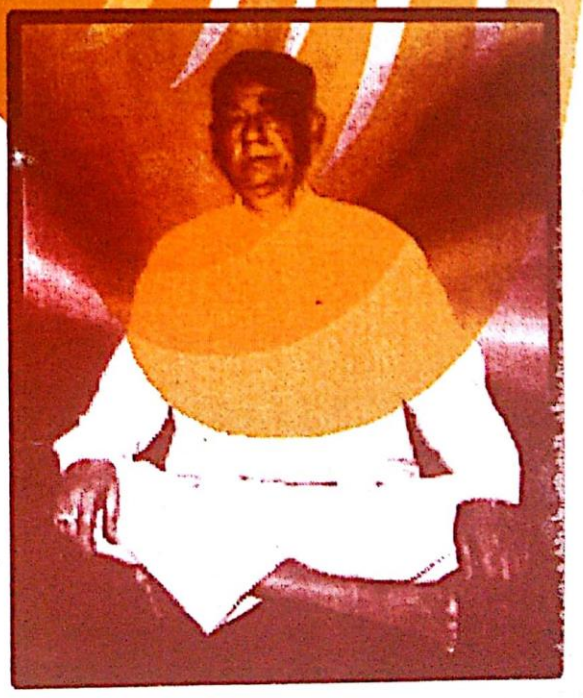

❁ " বিজ্ঞানানন্দ পত্রিকা " ❁

-: সম্পাদকীয় দপ্তর :-

৫৪ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা – ৭০০০২৬

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
☞ ভবানীপুরের কথা	● সম্পাদিকা	৪
☞ ওঁ বিজ্ঞানানন্দ কথামৃত	● ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ	৫
☞ "শতবর্ষের আলোকে স্বনামধন্যা এক - মানবীর আত্মনিবেদনের স্মৃতিচারণ "	● মৃণাল গুপ্ত	৬
☞ প্রাণহীন	● শ্রী তপন অধিকারী	১০
☞ দায়মুক্ত	● শ্রী তপন অধিকারী	১২
☞ "ক্ষণ"	● নূপুর চ্যাটার্জী	১৪
☞ "পূর্বাচলের পানে তাকাই"	● আলো রায়	১৭
☞ "রাম রহিম"	● পূবালিকা ভট্টাচার্য্য	২৩

ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী

আবির্ভাব : ৪ঠা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ১৯১২

তিরোধান : ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭

শ্রী শ্রী লেনিন রায়

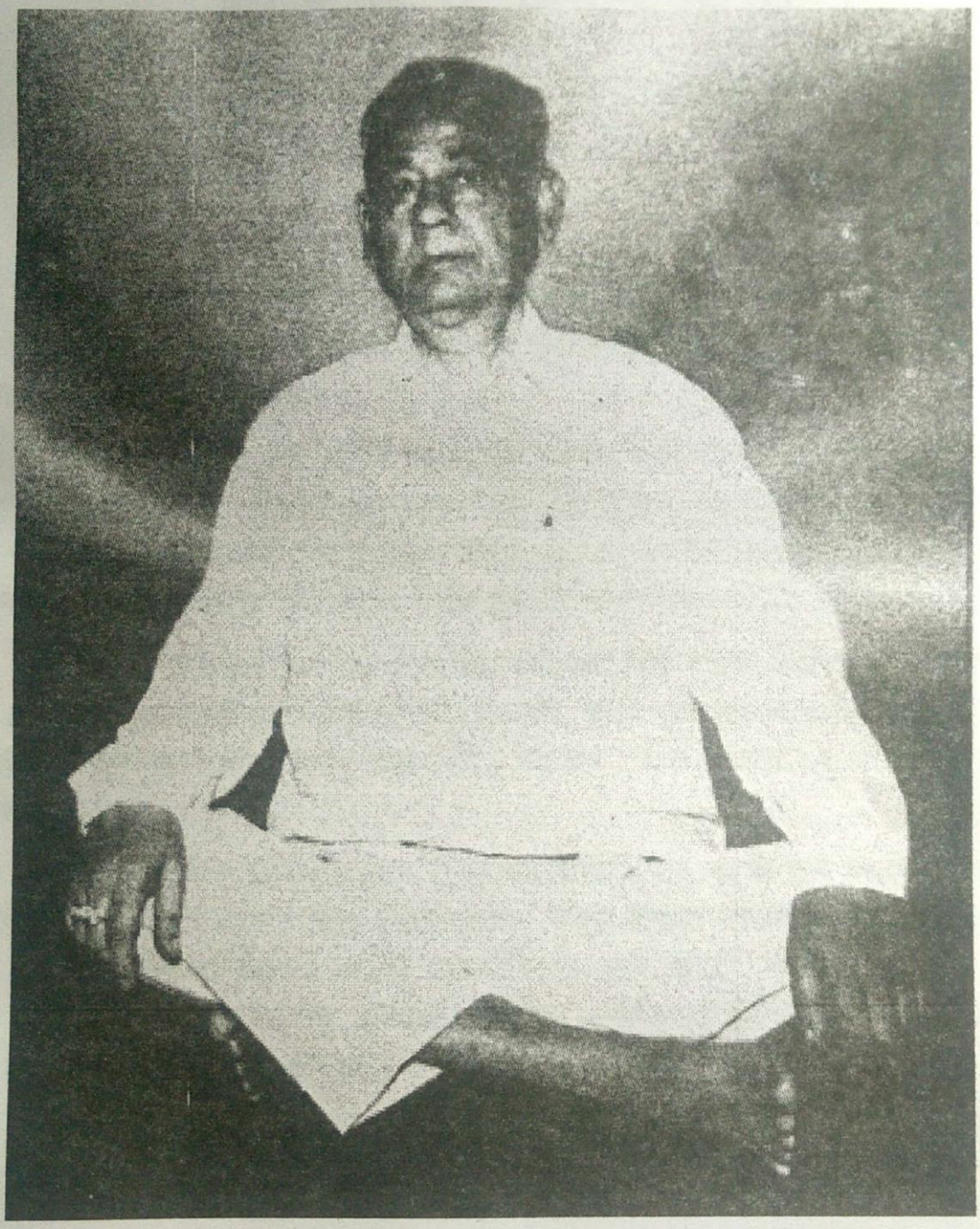

আবির্ভাব
৩০শে জুলাই, ১৯২৮

তিরোভাব
১লা এপ্রিল, ২০০৭

ভবানীপুরের কথা

এবার ঠাকুরের জন্মোৎসব ১৪ই এপ্রিল, ২০১৭, ঠাকুর তো নিত্য বর্তমান তবু আবির্ভাব তিথি আমরা মহা সমারোহে পালন করি কেন? কারণ ওই পূণ্যক্ষণটিতে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। ভাবের কথা নয়। একশভাগ সত্যি কথা।

সংসারের চলমান চাকায় ঘর্ষিত হতে হতে আমরা যারা চলেছি এবার ঠাকুরের আবির্ভাব ছিলো তাদের জন্য। এক্কেবারে সংসারী দের জন্য তিনি এসেছিলেন হয়তো তাকে Step Down করতে হয়েছে। ঠাকুরের লীলা বোঝা তো আমাদের সাধ্য নয়, তবুও মঠের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অধিকার টুকু তিনি দিয়েছেন বলেই বলতে পারি তিনি এবার যথার্থই সংসারীদের জন্যই এসেছেন।

এ পৃথিবীতে কত ধর্ম মার্গ কত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচারণ কিন্তু একটা জায়গায় একটা গভীর মিল দেখা যায় - সেটি হল ভগবানের প্রতি এক দুর্ণিবার আকর্ষণ, জগৎ ভুল হয়ে যাওয়া ভালোবাসা। বহিরঙ্গে যত পার্থক্যই থাক অন্তরমনে থাকে যথার্থ শাস্ত্র বিহিত শুদ্ধভাব। আর যেখানে এই ভাবটি থাকে সেখানে তো তিনি স্বপ্রকাশ।

'ভবানীপুর মঠ' ও তাই। এখানে ঠাকুর আমাদের কোন কাজে ভুল করতে দেন না। জীবনের নানান কাজ থেকে ছুটে এসে আমরা মঠের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখার যে প্রয়াস নিরন্তর করে চলি তা তিনি জানেন। ভুলতে দেন না তাঁকে —এটাই তো জীবনের পরম পাওয়া —তাকে ভুলি না। সমস্ত চেতনায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে তাঁর নাম-প্রার্থনা একটাই হে ঠাকুর - দুঃখে সুখে নিন্দা প্রশংসায় যেন তোমার নাম জপিত হয় আমার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে।

- সম্পাদিকা

ওঁ

বিজ্ঞানানন্দ কথামৃত

☛ জনে জনের মধ্যে যে হৃদয়ের খেলা হইয়া চলিয়াছে — উহাই তো বৃন্দাবন বিহারীর নিকুঞ্জ লীলা । তাং : ৩০/০৯/৬১

☛ হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় স্থির হয়। তাং : ৩০/০৯/৬১

☛ পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করলে — তবেই পবিত্র ভাব আসবে — নচেৎ শুদ্ধতা আশা করা বৃথা। তাং : ০২/০৬/৫৯

☛ ভাব কে পোষণ করিবার ইচ্ছাটাই —— মোহ। তাং : ১৫/০৩/৬৪

☛ কার্য্যতঃ দৃষ্টিকে সম ক্ষেত্রে ন্যস্ত করিতে হইবে। — ইহাই প্রথম কর্ম্ম। কারণ সত্যানুসন্ধানে পরিক্রমার পথে — ইহাই শূন্যস্থান। এই শূন্যই — নিরপেক্ষ — এই নিরপেক্ষতাই যথার্থ সত্যের যথার্থতা—। তাং : ১৫/০৩/৬৪

☛ নিরপেক্ষ অর্থাৎ পক্ষা-পক্ষ রহিত অবস্থা। তাং : ১৫/০৩/৬৪

☛ পক্ষাপক্ষের ভাবের উৎকর্ষতার প্রশ্ন নয় আসলে ও দুটি —আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তি— এই শক্তির দ্বারা সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইয়া ইহাতেই বাধ্য হইয়া পড়িতেছি। ইহার বাইরে থাকাই শাস্ত্রের উপদেশ।

☛ উত্থিত পদ্মাসনে সমান বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়।

।। শতবর্ষের আলোকে স্বনামধন্যা এক মানবীর আত্মনিবেদনের স্মৃতিচারণ ।।

মৃণাল গুপ্ত

শূন্য থেকে পূর্ণতে উত্তরণের অহঙ্কার, খ্যাতি, প্রাচুর্য, অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা মানুষের জীবনে আত্মতৃপ্তির ক্ষেত্রে যে পরিপূর্ণ উপকরণ হতে পারে না, — এমন এক মূল্যবান উপলব্ধির মুখোমুখী হবার দুর্লভ এক সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল। সময়টা বিগত শতকের সম্ভবত আশির দশকের সূচনায়। আমি তখন মহাকরণে (Writers' Building) রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে উপ-অধিকর্তা। দায়িত্বে রয়েছে তথ্যচিত্র নির্ম্মাণ সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রশাসনিক তদারকিতে। তখনও টি.ভির জনপ্রিয়তা তেমন বাড়েনি। ফলে লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগকেই নিতে হতো। মাসিক সংবাদ চিত্র এবং লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনমূলক তথ্যচিত্র সিনেমা হলে ও গ্রামে গঞ্জে বিভাগীয় পরিকাঠামোর মাধ্যমে Film Projector রের সাহায্যে প্রদর্শিত হতো। এছাড়া উপযুক্ত বিষয়, বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও স্মরণীয় ঘটনার তথ্যচিত্র সেলুলয়েডের মাধ্যমে তৈয়েরী করে (Film-Archive) য়ে রাখার একটা ব্যবস্থা চালু ছিল।

"৭৭" এ কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তখন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যচিত্র নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ এলে উনি চাইতেন চিত্র-পরিচালনার দায়িত্বটা আমি বহন করি। এটা আমার প্রতি তাঁর কোন "আদেশ-নামা" থাকতো না, বরং বলা যায় সেটা হতো অনুরোধ-নামা। কারণ চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ বা পরিচালনা — কোনোটাই আমার প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে আদৌ পড়তো না। তবে এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনে যোগ দিয়েও স্বেচ্ছায় যে কয়টি তথ্যচিত্র পরিচালনা করেছিলাম তা দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত ও প্রশংসিত হবার সুবাদে বুদ্ধদেব বাবুর একটা আস্থা আমার উপর ক্রমশঃ বেড়েছিল। ফলে একদিন ডেকে একটা প্রস্তাব আমাকে দিলেন। প্রস্তাবের বিষয়টা ছিল এইরকম — শুনেছি কানন দেবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল। আপনি সরকারী প্রযোজনায় ওঁনার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র করুন। এমন একজন প্রবাদ-প্রতিম অভিনেত্রী! ওনার উপর একটা নির্ভরযোগ্য তথ্যচিত্র Film Archive য়ে রাখা প্রয়োজন। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাবটা রাখুন। ওঁর মৌখিক সম্মতি পেলেই সরকারী ভাবে ওঁকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেবো।

এখানে কানন দেবীর সাথে আমার সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটা একটু বলা প্রয়োজন। সত্তরের দশকে যখন আমি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে এক প্রশাসনিক দায়িত্বে, তখন শ্রদ্ধেয়া কানন দেবী

ছিলেন কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Film Advisory Board য়ের অন্যতম সদস্য। আমার ভূমিকা ছিল ঐ Board এর সদস্য সচিবের। এই সূত্র ধরেই ওঁর সাথে আমার একটা শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কের সূচনা। ওঁকে আমি যে বয়সে কাছে পেয়েছি তখন ওঁর চোখে, মুখে, পোষাকে, আচরণে এক স্নেহময়ী মাতৃত্বের আকর্ষণীয় মহিমা। উনি এক স্নেহের আবর্তে ক্রমশ আমাকে যেন কাছে টেনে নিলেন। আমিও ওঁকে মাতৃসম শ্রদ্ধা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে ১৯৭৫ এ সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের নয়াগ্রামের আদিবাসী সাঁওতালদের উপর আমার রচিত একটি কাহিনীকে ভিত্তি করে তথ্যচিত্র নির্ম্মাণ করি। চলচ্চিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আদিবাসীরাই ঐ ছবিতে অভিনয় করে। "নয়াগ্রাম" ছবিটি যখন চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয় তখন শ্রদ্ধেয়া কানন দেবী এক আদিবাসী সাঁওতাল মেয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দেখেই স্মরণীয় মন্তব্য করেছিলেন — "এই সাঁওতাল মেয়েটি কি অসাধারণ অভিনয় করেছে মৃণাল! ওকে নিয়ে তুমি যদি আরও কয়েকটি ছবি কর তবে কিন্তু স্টুডিও আঙিনায় আমার মত অভিনেত্রীর ভাত মারা যাবে।"

এইসব প্রেক্ষাপট মন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর হয়তো কিছুটা জানা ছিল। ফলে তিনি উদ্যোগ নিয়ে একদিন ছবিটি শিশির মঞ্চে দেখলেন। পরে একদিন কানন দেবীর উপর একটি তথ্যচিত্র নির্ম্মাণের দায়িত্ব নিতে আমাকে অনুরোধ করলেন। Film Archive য়ে সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে যেহেতু কানন দেবী তাই তাঁর বৈশিষ্টটা কোন মাত্রায় এমন তথ্য পাঠকদের জানা প্রয়োজন। কানন দেবী (১৯১৬-১৯৯২) চলচ্চিত্র জগতে কানন বালা বলে সু-পরিচিতা ছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নায়িকাদের মধ্যে প্রথম গায়িকা ও বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম জনপ্রিয় তারকা হিসাবে তিনি চিহ্নিত। গানে ও নৃত্যে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। শৈশব কেটেছে এক দুঃসহ দারিদ্রে সম্বলহীনা মায়ের সান্নিধ্যে; নিষ্ঠুর সামাজিক অমর্যাদার মধ্যে। শুভানুধ্যায়ী তুলসী ব্যানার্জী দারিদ্রের সুরাহারের জন্য ১৯২৬ সালে ম্যাডাম থিয়েটারের প্রযোজিত 'জয়দেব' ছবিতে কিশোরী কন্যাকে ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন। এই প্রযোজনায় পর পর পাঁচটি ছবিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়। দুঃসহ দারিদ্রের চাপে অভিভাবকহীনা এই কুমারীকে বেশ কিছু অবাঞ্ছিত ভূমিকায় বাধ্য হয়েই অভিনয় করতে হয়েছিল। নানা অবমাননায় ও গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত এই মানবীর যথার্থ অভ্যুত্থান "মানময়ী গার্লস স্কুল" নামক ছবি দিয়ে। মুক্তি, শেষ উত্তর, পরিচয়, জবাব, তুফান্ মেল, চন্দ্রশেখর তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে দেয়। ১৯৪৯ এ তিনি শ্রীমতী পিক্চার্স নামে নিজস্ব প্রযোজনা ও পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের কাহিনী ভিত্তিক একাধিক ছবি নির্ম্মাণ করান। যে ছবিতে তিনি অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন সেখানে তিনি নিজের সুললিত কণ্ঠেই গানে দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। নেপথ্য সঙ্গীতের কোন প্রশ্নই ছিল না। শিল্পী হিসাবে তাঁর একান্ত নিষ্ঠাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আব্বারেখা, রাইচাঁদ বড়াল, কাজী নজরুল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে তালিম নিতে।

এমন প্রতিভাময়ী শ্রদ্ধেয়া মানবীটি পারিবারিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে বড় ক্লান্ত ছিলেন। কিশোর কাল থেকেই সামাজিক অমর্যদার চাপ তাঁকে পীড়া দিয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ হেরম্ব মৈত্রের পুত্র অশোক মৈত্র ১৯৪০ এ কানন দেবীকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের কট্টর পন্থীরা এই বিবাহে মারমুখী হয়ে ওঠে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ (যিনি কানন দেবীর কণ্ঠে তাঁরই রচিত গান শুনে মুগ্ধ হন) এই বিবাহ

উপলক্ষে আশীর্ব্বাদ সূচক উপহার পাঠাবার জন্য কট্টরপন্থী ব্রাহ্মসমাজের কাছে ভর্ৎসনার শিকার হন। কানন দেবী ক্রমশ বহুমুখী চাপের সম্মুখীন হন অভিনয় ছাড়ার জন্য। সৌভাগ্যের কথা তাঁর শিল্পী সত্তাই এই বিবাহ বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত করে। এমন অমানবিক চাপের স্বীকার হয়েও কানন দেবী দীর্ঘদিন তাঁর প্রাক্তন স্বামীর পরিবারের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। ১৯৪৯ এ বাংলার গর্ভনরের ADC হরিদাস ভট্টাচার্য্যের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ।

কানন দেবী বাংলার প্রথম অভিনেত্রী যিনি ভারতীয় সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য বহু পুরস্কারে ভূষিতা হন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি বিশ্ব ভারতীর শিরোপা, ভারত সরকারের পদ্মশ্রী (১৯৬৮), দাদাভাই ফালকে পুরস্কার (১৯৭৬) এবং ২০১১ এ তাঁরই সম্মান ও স্মৃতিতে ডাক বিভাগের প্রকাশিত তাঁর ছবিসহ (Stamp) স্টাম্প।

এমন এক প্রবাদ প্রতিম মানবীর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র করার দায়িত্ব পাবো ভেবে গর্বিত হই। নানা তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হই। ওঁর সমসাময়িক অন্যান্য চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগাযোগে সচেষ্ট হই। প্রশাসনিক চাপের ফাঁকে ফাঁকে চিত্র নাট্যের খসড়া করি। এমন এক প্রাথমিক প্রস্তুতির পর শ্রদ্ধেয়া কানন দেবীকে ফোন করে সাক্ষাতের সময় চাই। উদ্দেশ্যটা কিন্তু বলি না। উনি খুশি মনে বিকেলে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে যেতে বলেন। দক্ষিণ কোলকাতার বাঁশদ্রোনী এলাকায় রিজেন্ট গ্রোভ নামে এক প্রশস্ত চত্বরে ওঁর বাড়ী। গেটের দারোয়ান মাঠ পেরিয়ে আমাকে বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড় করালো। কলিং বেল টিপতেই কানন দেবী নিজেই দরজা খুললেন। আমি অভ্যেস অনুযায়ী প্রণাম করলাম। মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, "বড় খুশি হয়েছি, তুমি এসেছ"।

সাবেকী আসবাব সজ্জিত এক ঘরে আমরা দুজনে বসলাম। শুরুতেই বললেন "আমার বাড়ী এখন শুনশান। নাতি, ছেলে, বৌ সবাই বেড়াতে এখন কলকাতার বাইরে। নাতি থাকলে কি আর তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ পেতাম।" বুঝলাম নাতির সাথে উনিও এখন দ্বিতীয় শৈশবের মুখোমুখী। ইতিমধ্যে চা এলো। কথা প্রসঙ্গে কানন দেবী বললেন, — 'আজ তোমাকে বাইরের কেনা জিনিস দেবো না, নিজের হাতে করা জিনিস খাওয়াবো'।

নানা কথা বার্তার ভিড়ে আসল প্রস্তাবটা প্রকাশ করতে একটু সময় লেগেছিল। শেষমেষ বলেই ফেললাম। প্রস্তাবটা শুনেই উনি চমকে উঠলেন ' — সেকি! আমাকে নিয়ে আবার সরকার তথ্যচিত্র করার কথা ভাবছে, — কেন? আমি তো আর কাননবালা নই। ক্যামেরার সামনে আমি আর দাঁড়াবোই না।'

চমকে উঠি আমি! বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ' — আপনার যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠার কথা আমি ছেড়েই দিলাম। আপনার শিল্পীমনের সংগ্রাম, একাগ্রতা, নিষ্ঠার যে অমূল্য স্বাক্ষর আপনি রেখে গেলেন তাইতো মহিলাদের কাছে দিশারী হবে। মহিলা অভিনেত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবেই তো আপনি 'মহিলা শিল্পী মহল' নামে এক সংস্থার সূচনা করেছেন। ভবিষ্যত প্রজন্মের সংগ্রামের জন্যই তা তথ্যচিত্রে সংরক্ষিত হওয়া উচিত। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েই তো আপনার কীর্তি, আপনার সাফল্য।

উনি হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠলেন। এগিয়ে আমার ঘাড়ে হাতটি রেখে বললেন, 'এসো আমার সাথে'। পাশের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে দাঁড় করালেন, — 'কি দেখছো এখানে ?'

বললাম, 'এটা তো দেখছি 'ঠাকুর ঘর'। আসনে গোপাল বসে।'

কানন দেবী আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, —'এই গোপালের কাছেই আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। আমার মান, সম্মান, সাফল্য, সেই সাথে আমার মনের দুঃখও। তোমাকে নিজের হাতের জিনিস খাওয়াবো বলেছি তাও গোপালেরই নিত্য সেবায় তৈয়ারী হালুয়া ও ঘরে ছানা কাটা সন্দেশের মন্ডা। এবার বুঝতে পারছো তো আমি এখন সমর্পিত। তুমি কেমন করে কানন দেবীর উপর তথ্যচিত্র করবে? আমার তো নিজের কিছুই নেই।'

মোহগ্রস্থের মত শূন্য হাতেই সেদিন বাড়ী ফিরেছিলাম। তবে মন বলেছিল, বোধের ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা বড় প্রাপ্তিযোগ ঘটে গেল!

১৯৩০ -এর দশকে কানন দেবী

প্রাণহীন

শ্রী তপন অধিকারী

মৃত মানুষের মিছিল চলেছে
শহরে ও গ্রামান্তরে।
দিন হতে রাত, রাত হতে ভোর
ঘুরিয়া ফিরিছে দোর হতে দোর
প্রাণহীন মুখে ধক্‌ধক্‌ জ্বলে
ক্ষুধিত হায়না চোখ।
মানুষের সব মৃত দেহে খায়
তাই নিয়ে চলে হানাহানি হায়
জিঘাংসা ভরা হৃদয়ের মাঝে
মন মোরে গেছে কবে,
মিছিল চলিছে চলেছে মিছিল
মৃত মানুষের শবে।
ক্ষণিকের ভুলে প্রাণ যায় চলে
রক্ত পিপাসু নিজ বাহু বলে
ছুরিকার ন্যায় নখ দাঁত দিয়ে
আঘাত করিয়া চলে,
আপন বা পর বুঝিতে চাহে না
সবই গেছে আজ ভুলে।
স্তুপ হয়ে থাকা গলিত এ দেহ
স্রোতে বয়ে যাবে কবে?
মিছিল চলিছে চলেছে মিছিল
মৃত মানুষের শবে।

কৈশোরে ছিল হাসি ভরা মুখ
যৌবনে ছিল গান,
প্রাণময় ছিল জীবনের ধারা
ভেঙে হল খান খান।
মন মরে গিয়ে রয়ে গেল সব
লাখ লাখ সব করে কলোরব,
প্রেত সমাজের কালো সূর্যের
আঁধার নেমেছে কবে
মিছিল চীরছে চলেছে মিছিল
মৃত মানুষের শবে॥

দায়মুক্ত

শ্রী তপন অধিকারী

তুমি তো এসেছিলে ঝড়ের আকারে
বৃষ্টি তো তখনও নামেনি,
হৃদয় যে ছিল স্বপ্নে ভরা,
দু'চোখের পাতা ভেজেনি।

তোমারই আলোয় আলোকিত আমি
উড়ে তো চলেছি থামিনি,
কোথায় যে নিয়ে চলেছো তুমি
সে কথা কখনও ভাবিনি।
তুমি তো এসেছিলে ঝড়ের আকারে
বৃষ্টি তো তখনও নামেনি।

তোমারই পরশে ধন্য যে আমি
তোমারই পরশে সোনা,
তোমার সৌরভে সুরভিত আমি
সে কথা কখনও ভুলিনি।
তুমি তো এসেছিলে ঝড়ের আকারে
বৃষ্টি তো তখনও নামেনি।

থেমে গেছে ঝড়, শান্ত নীরব
ঝরা পাতাদের দাপানি,
নিজেকে দেখি যে নতুন রূপে
স্বপ্নে যা কভু ভাবিনি।

ভেঙেছে শরীর, ভেঙেছে যে মন
ধরেছে কঠিন পাগলামি,
সোনা বলে যারে মেকি করে দিলে
ঝড় থেমে যেতে দিলে ছুঁড়ে ফেলে
হৃদয় কি একবারও কাঁপেনি?
তুমি তো এসেছিলে ঝড়ের আকারে
বৃষ্টি তো তখনও নামেনি ॥

"ক্ষণ"

নূপুর চ্যাটার্জী

ছোট বেলা থেকে বড়দের একটা কথা বলতে শুনেছি ভেবে কথা বলবে কথা ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায়। তখন থেকেই ক্ষণ কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। ক্ষণ এর অর্থ মুহূর্ত। কিন্তু শুধুই মুহূর্ত বললে 'ক্ষণ' কথাটি অর্থ যেন অসমাপ্তই থেকে যায়। মনে হয় একটা 'নির্দিষ্ট মুহূর্ত' বললে এর অর্থের কাছাকাছি যাওয়া যায়। তারপর জীবন যত এগিয়ে গেছে এই ক্ষণ তার স্বরূপ নিয়ে এসেছে বারবার।

মানুষ যখন তার প্রার্থিত বস্তু কে লাভ করে সেই মুহূর্ত ভগবান কে ধন্যবাদ দেয় বা নিজের সাফল্য নিজের ক্ষমতার তারিফ করে। আবার যখন যে তার সকল প্রচেষ্টা প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয় তখন ভগবান কে সে দোষারোপ করে বা নিজের ব্যর্থতায় অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে। এ সংসারের নিত্য ঘটনা।

ধরা যাক আমি একটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রভূত প্রস্তুতি নিয়েছি কিন্তু সঠিক ফল লাভ হল না— অর্থাৎ ঐ সাফল্যের ক্ষণটি এল না — কেন এল না এটা কিন্তু দেখতে পাই না — অন্য আর একজন সেটি লাভ করেছে এই বেদনায় ক্লিষ্ট হই। তার অর্থ আমি আমার যে প্রস্তুতি নিয়েছি তা চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল না যা আমাকে ঐ সাফল্যের ক্ষণ লাভে সাহায্য করে। অথবা ঐ না পাওয়াটা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক যা আমি দেখতে পাই না। ঐ সময়ের জন্য ওটাই আমার পক্ষে সঠিক। কিন্তু এ কথা সেই সময় আমরা বুঝতে পারি না — কেবলই বেদনার্ত হয়ে পড়ি। অর্থের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য তখন চাই সৎগ্রন্থ সৎসঙ্গ। এটাও আসে আমার অন্তরের আকুলতা থেকে যদি আমি বুঝতে চাই কেন এমন হলো। এইটুকু সত্যি যে আমাদের ঐ ক্ষণটি লাভ করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন নিখাদ প্রস্তুতি চাই আর তার সাথে চাই প্রার্থনা তবেই ঐ ক্ষণটি আসে। কথা ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যাওয়াও তাই। যে ঘটনা ঘটবে তার কম্পনাঙ্ক এক হলেই কথাটি ক্ষণে পড়ে যায়। সাফল্য আসলে ক্ষণ এ পড়ে, অঘটন ঘটলে অক্ষণে পড়ে। অর্থাৎ ফলটি আমি চাই না বলেই অক্ষণ কথাটা ব্যবহার হয়। ছোট বেলায় লালা বাবুর গল্প শুনেছি বিখ্যাত লালা বাবু বাড়ি ফিরছিলাম সন্ধ্যে হয়ে আসছে শুনলেন কোন এক রজকিনী তার বাবাকে বলেছে "বেলা যে পরে এলো — বাস্‌নায় আগুন দাও।" রজকিনী পিতাকে কলা গাছের শুকনো খোল — বাস্‌না জ্বালিয়ে অপরিস্কার কাপড় কাচার জল বসাতে বলছে। এরকম হয়ত রোজই বলে — কিন্তু লালাবাবু সেই শুনে গৃহত্যাগ করলেন — আর সংসারে ফিরলেন না।

আরও একটা গল্প — একজন স্ত্রী তার ঘোর সংসারী স্বামীকে পড়শির বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বললেন জানো তো অমুক বাবুর বউ বল্‌লো তার স্বামী একদম উদাস সংসারে মোটে মন নেই — রোজই

বলেন সংসার ত্যাগ করবেন। ঘোর সংসারী স্বামী মুচকি হেসে বললেন এমনি বলে বলে কি সংসার ত্যাগ হয় এই আমি এখুনি সংসার ত্যাগ করছি — এই বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্ত্রী ভাবলেন ঠাট্টা — কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেন নি সত্যিই সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

কেন এই দুটি গল্পের অবতারণা, প্রশ্ন জাগে এটা কি হঠাৎ করে হয়, এ পৃথিবীতে কারণ ছাড়া তো কোন কাজ হয় না — তাহলে?

এই মানসিক পরিবর্তন একটি কথায় পরিবর্ত্তিত হতে পারে না। অর্ন্তঃজগতে তার প্রস্তুতি চলে নীরবে সংসারের চলমান নাট্যাভিনয়ে ধরা পরে না কিছুই। কিন্তু ভিতরে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় ভাবতরঙ্গ — যা ঘনীভূত রূপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খসে পড়ে বহিবারণ — সে বেড়িয়ে পড়ে তার প্রার্থিত উদ্দ্যেশ্যে। যেমন করে জল গরম হতে হতে হঠাৎ ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌছন মাত্র ফুটে ওঠে। ওটাই জলের স্ফুটনাঙ্ক। ওটাই তার ক্ষণ।

তাহলে প্রকৃত কথাটি হল মহত্তর ভাবের ক্রমাগত উত্তরণ আর উত্তরণের ঘনীভূত রূপের প্রকাশ মুহূর্তটাই তার ক্ষণ।

মনুষ্য জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেকে জানা — অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে জ্ঞাত হওয়া আর জ্ঞাত হওয়ার সাথে সাথে ঘটে পরমাত্মার অন্বেষা — এই অন্বেষা তাকে নিয়ে যায় নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী মার্গে। যে যে মার্গেই যান না কেন — সরু গলি — আল পথ — বন পথ — পিচ্ছিল পথ — কন্টকাকীর্ণ পথ — লক্ষ্য কিন্তু রাজ পথ — কারণ রাজ পথেই তো সোনার রথে আরূঢ় রাজার সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। সম্ভাবনা কেন?

এইখানেই একটা চরমতম ক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে অনেক কষ্ট করে মমুক্ষু যখন এসে পৌছাল — তখন রাজার দেখা পাবেন এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না — অপেক্ষা করতে হয় তাঁর কৃপার উপর— মন্দিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেই দরজা খুলবে ও নিশ্চয়তা নেই — সেখানেই তাঁর কৃপা তিনি কৃপা করলে তবেই সাক্ষাত। গীতায় আছে — বহু জন্মের পূণ্য ফলে জীব মনুষ্য জন্ম লাভ করে — কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন মুমুক্ষু হন — আর অসংখ্য মুমুক্ষুর মধ্যে থেকে একজন তাকে পায়।

তাহলে ঐ অসংখ্য মুমুক্ষুর মধ্যে মাত্র একজন কেন তার কাছে যেতে পারে ?

নিশ্চয়ই অন্যান্যদের থেকে তিনি চরমতম অবস্থা লাভ করেছেন — একটা ক্ষণ — ভক্তদের চূড়ান্ত ঘনীভূত ভক্তিতে সম্পূর্ণ সমর্পণ আর পরম পুরুষের কৃপা একই ক্ষণে ঘটে থাকে। আরও একটা গল্প মনে পড়ে দেবর্ষি নারদ যাচ্ছিলেন নারায়ণের সাথে দেখা করতে পথে দেখা হল এক সাধুর সাথে — সাধু বললেন তাঁর কাছে জেনে আসবেন কবে আমার মুক্তি? আরও একজন মানুষের সাথে দেখা হল নারদের — সেই লোক বললেন আমার কবে মুক্তি হবে জেনে আসবেন?

ফেরার পথে নারদ সাধুকে বললেন আপনার তিন জন্ম পরে মুক্তি হবে। সাধুর মুখটি বিষন্ন হয়ে গেল। আর ওই সাধারণ লোকটিকে নারদ বললেন আপনি যে তেঁতুল গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে আছেন তার

যত পাতা আছে তত গুলি জন্ম পরে আপনার মুক্তি হবে। লোকটি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো — তার মুখে ফুটে উঠলো তীব্র আনন্দের ছটা। বললেন আমার মুক্তি হবে, সেই মুহূর্তেই সেই ক্ষণেই লোকটির মুক্তি ঘটলো।

অর্থাৎ ওর ভিতরে ছিল মুক্তির জন্য নিখাদ নির্ভেজাল ষোলোআনা ভক্তি এবং মুক্তির — আকাঙ্খা যা পরিপূর্ণতায় টলমল করছিল কত জন্ম তার কাছে অর্থহীন মুক্তি হবে এই অটল প্রত্যয় ই তাকে ভগবানের কৃপার অধিকারী করেছিল — ঐ ক্ষণে ॥

পূর্বাচলের পানে তাকাই

আলো রায়

আমরা জীবনের এই অস্তাচলের প্রান্তে এসে দেখি যে যাদের জীবনে একান্ত করে পেয়েছিলুম, আমার মা-বাবা, আমার স্বামী — এঁরা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। একান্ত আপন ছেলেমেয়েরা, তারাও তো জীবিকার সন্ধানে কত দূরে দূরে রয়েছেন।

তাই ভাবছিলাম এই যে সবার শান্তিনিকেতন, যা আমার একান্ত শান্তি নিকেতন তা কিন্তু সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। মনে হল শান্তি নিকেতনের ফেলে আসা দিনগুলোতে নানা পাওয়া নানা শেখার ঋণ কোনোদিই শোধ হবার নয় কিন্তু তাকে স্বীকার করা নিশ্চয় সম্ভব। তাই এ লেখার প্রচেষ্টা।

১৯৬৪-এ এলাম শান্তিনিকেতনে পাঠ ভবনের শিশু বিভাগে। এই আমার প্রথম কোনো স্কুলে পড়া। তখন যাঁরা আমাদের পড়াতেন তাঁরা তাঁদের দরদী মনের প্রদীপের আলোতে আমাদের মনে আলো জ্বালাতে পারতেন — জগবন্ধুদা, তনয়দা, বিশ্বনাথদা, গোঁসাইজী, মোশাইজী, নলিনীদি, নিরঞ্জনদা, কাশীনাথদা, ললিতদা, সুদর্শনাদি— আরো কতজন ছিলেন।

১৯৬৪-এর ১২ই জানুয়ারি দিনটা স্পষ্ট রঙে আঁকা। মা-বাবার মন খারাপ একমাত্র মেয়েকে ছেড়ে যেতে, কিন্তু আমি আসনহাতে নতুন বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে মহা আনন্দে গোঁসইজীর বাংলা, তনয়দার ইংরাজি আর জগবন্ধুদার অঙ্ক ক্লাস করলাম। তারপর সেই পড়ন্ত বেলায় মোহরদির গানের আর বিপিন সিংজীর নাচের ক্লাস হল। সঙ্গীতভবনের পশ্চিমের ছোটঘরের জানালায় বসেছেন মোহরদি— শীতের বেলাশেষের রোদ পড়েছে সেখানে — সেই প্রথম আমাদের গান শেখালেন মোহরদি "পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি..."

তখন সে গানের অর্থ না বুঝলেও আজ নিশ্চয় বুঝি। তারপরের কতশত ভাললাগা ঘটনা, তা ধরা রইল আমার মনে। এর আগে আমি ছিলাম অসমের একটি শহরে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে হিসাবে তখনকার দিনে মেলামেশাতে একটা বাধ্যবাধকতা ছিল, আর বাড়ীতেও তো মা-বাবার সঙ্গে একাই ছিলাম। কাজেই শন্তিনিকেতনে এসে যেন একটা বাঁধনছাড়া জীবন পেলাম। তা উৎ-শৃঙ্খল নয়, সুশৃঙ্খল। আরম্ভ হল পাঁচমিশালী নানা কাজের, নানা শেখার জীবনযাত্রা।

এর কিছুদিন পরই আমাদের ডাক এল 'উত্তরায়ণে' বৌঠানের (রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী) কাছ থেকে। তাঁদের কালিম্পঙের বাড়ি থেকে এসেছে ঝুড়ি ঝুড়ি কমলালেবু — তাই দিলেন আমাদের নিজে, প্রত্যেককে।

ওমা ! তারই কিছুদিন পর 'মালঞ্চ' থেকে মীরাদি (রবীন্দ্রনাথের ছোটকন্যা) শিশু বিভাগের ছেলেদের একদিন, মেয়েদের একদিন ডাকলেন। পেয়ারা গাছ থেকে আমাদের নিজের হাতে দুটো করে পেয়ারা পেড়ে নেবার জন্য। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবের মর্যাদা আর কোথায় দেখা যায়! প্রতিবছর অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করতাম ঐ দিনগুলির জন্য।

মাঝে মাঝেই বুধবার মন্দিরে উপাসনা শেষে উত্তরায়ণে টেনিসকোর্টের পাশের বেদিতে অবুদাদু (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গপ্প শোনাতেন রামায়ণের। মস্ত বড়ো জোব্বাপরা অবুদাদু বসতেন মস্ত বড়ো easy chair-এ, আমরা বেদির মেঝেতে শতরঞ্চিতে। তিনি শোনাচ্ছেন সীতাহরণ কাহিনী, হাতে তাঁর কুটুম কাটামের পুষ্পক রথ, বলছেন, রাবণ নাকি সীতাকে হরণ করে চলেছে লঙ্কার পথে। হাতটায় সামান্য ঢেউ খেলাচ্ছেন সেই পুষ্পকরথে আর একটা ছোট্ট লাল কাপড়ের টুকরো দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে, সেটাই সীতাদেবী। হঠাৎ বললাম, কৈ, সীতার গয়না তো ঝড়ে পড়ছে না ? আবার হাতটা একটু নাড়তেই সোনাঝুরি ফুলের মতো কি যেন ঝরে পড়তে লাগল। সীতার কথা ভেবে খুব কাঁদছি যখন, তখন কাছে ডেকে অবুদাদু পীঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক কিছু বললেন, কিন্তু মনে আছে সামান্যই —শুনলাম "সৃষ্টির বুকে কান্না লেগেই আছে" —অর্থ বুঝিনি তখন, কিন্তু মনে রয়ে গেল কথাটা। আজ তার অর্থ বুঝি খানিকটা। তেমনি বুধবারে যে ক্ষিতিদাদু মন্দির নিতেন, তখন কি তার অর্থ বুঝতাম! কিন্তু বড়ো হবার পর মনে-প্রাণে সেগুলো অনুপ্রাণিত হতে থাকল — আর নিজের অজান্তেই অতগুলো উপনিষদের মন্ত্র মনে গেঁথে গেছে কখন কে জানে। আজ সেগুলো উচ্চারণ করতে, ভাবতে ভালো লাগে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে কখনো সাহিত্যসভা, কখনো হাতে-লেখা পত্রিকার লেখা লিখতে, ছবি আঁকতে আঁকতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পেরিয়ে যেত —সেখানের মূলধন কেবল আনন্দ। তখন শ্রীভবনে থাকতাম বলে হয়তো খিদেটা পেত বেশি —তাই হয়তো কখন কোথায় কোন গাছে কুল পাকছে, পেয়ারা পাকছে বা কাঁচা আমের সন্ধানে যেতে হবে তা একবারে নখদর্পণে ছিল। গাব আর ক্ষীরকুল বলে ফল দুটি কিন্তু আমি আর কোথাও পাইও নি, খাইও নি। এও কি কম জানা!

পড়াশোনার আনন্দও ছিল খুব। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের পাশে 'তালধ্বজে'র কুটির বাসী তেজেশদা বললেন বাংলা ক্লাসে 'বসন্তকাল' সম্বন্ধে লিখতে। 'বসন্তকাল' যে কেমন কাল তা জানতামই না। তেজেশদা আশ্রমে ঘুরে ঘুরে গাছে গাছে বসন্তের ফুল চেনালেন। বোঝালেন যে শীতের পৌষমেলার কিছুদিন পর যখন আর তেমন ঠান্ডা থাকে না, গরম জামাকাপড় পরি না, তখন বসন্তকাল। আর ভালো লাগা যে বাতাসটা বইতে থাকে, সেটাই বসন্তের দখিনাবাতাস। এরপর চোখ দেখতে শিখল, মন জানতে চাইল আর শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায় একের পর এক ঋতুকে দেখতে পেলাম।

এমন বসন্তে একদিন শৈলজাদা (শৈলজারঞ্জন মজুমদার) ডাকলেন আগামী বসন্তোৎসবের নাচের মহড়ায়। সঙ্গীতভবনের পাশে, কলাভবনের কালো বাড়ির সামনে ঋজু ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে চলত নাচের মহড়া। "খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল ....." গানের সঙ্গে নাচ। সেইসঙ্গে আমাদেরও চোখ দেখতে শিখত "রাঙাহাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে", আর নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিন্দোল"। মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অদেখাকে দেখতে, অচেনাকে চিনতে আর অজানাকে জানতে শিখলাম

আমরা। প্রকৃতিকে বন্ধুর মত মনে হত।

তেজেশদা আর কুবেরদা নিতেন প্রকৃতিচর্চার ক্লাস। তাঁরা শেখালেন গুটি পোকা পোষাতে। গুটিপোকা জোগাড় করে বাক্সে রেখে পাতা খাওয়াতে খাওয়াতে একদিন তারা নিজেদের বেঁধে ফেলত। অধীর আগ্রহে রোজ দেখতাম, বেশ কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন খোলস থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে আসত, আর আনন্দে উড়িয়ে দিতাম তাদের। Life cycle of butterfly কিন্তু কখনো বই পড়ে মুখস্ত করতে হয় নি। জেনেছিলাম, শিখেছিলাম হাতে কলমে, আনন্দে।

প্রায়ই তো রচনা লিখতে হত ক্লাসে। হঠাৎ একদিন নলিনীদি ঐ খাতায় লিখলেন রচনার পাশে 'সাহিত্যসভা'। পরে বুঝেছিলাম যে সাহিত্যসভায় পড়তে হবে। তার পরের বছর যখন সাহিত্যসভার সম্পাদিকা হলাম, তখন শিখলাম সভার সভাপতি নির্বাচন করা, সভার অনুষ্ঠানসূচি লেখা, কিভাবে সভার বিজ্ঞপ্তি লিখে সবাইকে আহ্বান করতে হয়, আর সভা সাজাতে হয়। লক্ষ্য করতাম সভার গানগুলিও গাওয়া হত ঋতু অনুযায়ী। এর সঙ্গে সঙ্গে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলা, পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা stage-free হয়ে যেতাম। সভাশেষে সাধারণের বক্তব্য ও সভাপতির বক্তব্য থাকত। তাতে আমরাও সমালোচনা করতে পারতাম। বিশ্লেষণাত্মক মনও তৈরি হত।

সাহিত্যসভার লেখাগুলো থেকে হাতে-লেখা পত্রিকা বের হত। আর বছর শেষে সেই লেখাগুলো থেকে বেছে ও আরও লেখা জড়ো করে প্রকাশিত হত ছাপার অক্ষরে 'আমাদের লেখা' পত্রিকা। নিজেদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে যে কি আনন্দ হত তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আজকের এই লেখা সেই শেখারই প্রকাশ বললে অত্যুক্তি হবে না। সখাসংঘ হল একটি নিজেদের তৈরি ছোট্ট গ্রন্থাগার, একটি বা দুটি আলমারির ভরা বই —কখনো হয়তো মূল গ্রন্থাগার থেকে শিক্ষকেরা কিছু বই আনতেন, আর আমরাই সম্পাদক-সম্পাদিকার মাধ্যমে চালাতাম।

বিচার বিভাগে তো তিনবার নাম উঠলেই শান্তিনিকেতনের জীবন থেকে বিদায় নিতে হত। কত বড়ো দায়িত্ব দিতেন তখনকার দিনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবশ্যই তাঁরা থাকতেন কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময়। তাই বলছিলাম যে এই শৃঙ্খলার মধ্যেই কেমন স্বাধীনতা!

খাদ্যবিভাগের তদারকে সবাইকে প্রতি সপ্তাহে পরিবেশন করে খেতে হত। একটু বড়ো হতেই ডাক পড়লো উত্তরায়ণে পরিবেশনের জন্য। ৭ই পৌষের সময় সমাবর্তন উৎসবে আসবেন নেহেরুজী, পদ্মজা নাইডু, এবং আরো অনেক গণ্যমান্যজন। সন্ধ্যায় তাঁদের সেখানেই পশ্চিমের ঘরে নাচগান শুনিয়ে রাতের খাবার দেওয়া হবে। আমরা নাচব ও পরে পরিবেশন করব। কি আনন্দ আর কত বড়ো অভিজ্ঞতা।

সেবা বিভাগের কথা বললেই মনে পড়ে ললিতদার কথা। আদিত্যপুর, বল্লভপুর, পারুলডাঙা আরো কত গ্রামে যাওয়া — অ,আ, ক, খ, শেখানো, শ্লেট-পেন্সিল বিতরণ, এছাড়া ওদের সঙ্গে মুড়ি আর তেলেভাজা খাওয়া, গ্রামের খবরাখবর জানা ...। তখনও কিন্তু ভারত সরকার তেমনভাবে সাক্ষরতা প্রচারে নাবেন নি — তাই সেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যে ব্যাক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন এইসব চিন্তার পুরোধাতে, তাঁকে ধীরে ধীরে প্রণাম জানাই। বড়োরা, মানে অল্প বড়ো যারা, যেমন অমর্ত্যদা, অলোকদা, তপতীদি, ইন্দ্রাণীদিদের

সেবা বিভাগের কাজে গ্রামে যেতে দেখে ভাবতাম - কবে আমরা যাব ? ভেতর থেকেই ইচ্ছা জাগত—জোর করে পরিকল্পনা চাপিয়ে দিত না কেউ।

বর্ষার ধারা থেমে গিয়ে শরৎ-এর সোনালি রোদ্দুরে ভরা দিনে ঠিক পূজার ছুটির আগেই, মহালয়ার দিনে জমে উঠত আমাদের আনন্দমেলা/আনন্দবাজার। মেলার প্রস্তুতি, মেলা গড়া, বিকিকিনি আর লাভের টাকা সেবাবিভাগে দেওয়া। এছাড়াও দলে দলে বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে আশ্রমবাসীর কাছে সেবাবিভাগের জন্য টাকা তোলা হত। এমনি করেই খানিকটা গ্রাম-সেবার মন তৈরি হত।

খেলার মাঠে কত ধরণের খেলার সুযোগ ছিল আমাদের। বাৎসরিক প্রতিযোগিতা তো হতই। কয়েক বছর আগে আমার ছেলে Boston, U.S.A -তে আমাদের খেলাধূলার যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে Redsox আর অন্য একদলের Baseball খেলা দেখাতে নিয়ে গেল। খেলাটা বোঝাতে চাইলে সগর্বে বললাম আমরা শান্তিনিকেতনে কত খেলেছি। দেখলাম প্রায় একই নিয়মকানুন আছে খেলার। কত নামকরা দল আসত খেলতে আশ্রমে।

তারপর প্রতিবছর পৌষমেলা শেষে বিভিন্ন ভবন থেকে ৭/৮ দিনের জন্য বেড়াতে যেতাম কোথাও। পুরী-ভুবনেশ্বর, দেওঘর, কোডারমা, নালন্দা, ইলোরা-অজন্তা বা বড়ো বড়ো শহরে। ভীমবাঁধে বেড়ানো বা excursion তো জীবনের এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

কেবল জায়গা দেখা নয় ——একসঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকা-খাওয়া, কাজ করা —সবই চলত। রান্নাবান্নায় সাহায্য করা, কুটনো কোটা, লণ্ঠন পরিষ্কার করা এবং সন্ধ্যায় তা জ্বালানো - সবই শিখলাম ধীরে ধীরে এই বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে। কতগল্প শোনা – কত acting, Dumb Sharade খেলা চলত বারে বারে কফি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে। সাত দিন ক্রমান্বয়ে সারারাত camp fire এর পাশে আড্ডা দেওয়ার অবিস্মরণীয়। আবার আশ্রম পার্টির সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ, শ্যামা মঞ্চস্থ করতে দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ যাওয়া বা বর্মা দেশের Tagore Society-র আমন্ত্রণে নাচগান শেখাতে যাওয়ার কথা ভাবলেই আনন্দ বড়ো হয়ে ওঠে। কালোর দোকানের কালো যেত খাবার-দাবারের in-charge হয়ে, পথে কালোই এ কাজ করতেন। মোহরদি, বাচ্চুদিরা গানের দলে, বুড়িদি সেবাদিরা নাচের দলে, এছাড়া সুরেনদা (সুরেন কর মশাই) আমাদের সঙ্গে যেতেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে।

একবারের ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। সেবারে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের শেষে "এস বসন্ত ধরাতলে" নাচের দলে ছেলেদের সংখ্যা কম থাকায় আমার আর শিখার ঐ নাচে ছেলে সেজে নাচতে হয়েছিল। আমরাই সবথেকে ছোট ছিলাম। শোনা গেল যে অনুষ্ঠান শেষে উদয়শঙ্কর আর অমলাশঙ্কর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। অমরা তক্ষুনি গৌরীদি, বিশুদা এবং সুরেনদাকে বললাম, আমরা ঐ ছেলের পোশাকে এঁদের সঙ্গে দেখা করব না এবং দেখা না করেও ছাড়ব না। ঠিক হল drop scene পড়বার আগে আমরা নাচতে নাচতে দুজনে বেরিয়ে যাব আর আগে থেকে তৈরি করা অর্থাৎ stitched শাড়ি নিয়ে গৌরীদি প্রস্তুত থাকবেন। এই stitched শাড়ি গৌরীদিরা কেবলমাত্র সুরূপা চিত্রাঙ্গদার জন্যই তৈরি করতেন। তাড়াতাড়ি বিশুদা আমাদের গোঁফ মুছে কপালে টিপ পরালেন টিপ পরালেন আর গৌরীদি শাড়ি পরালেন। আমরা মহানন্দে দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিশোরমনে তৃপ্তি ও আনন্দ সে যুগের

বয়োজ্যেষ্ঠরা দিতে জানতেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে অতি সহজে মিশতাম। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই ছিল আমাদের সম্বল। জীবনপথে যতই এখন ঘুরি এখানে- সেখানে, তবুও শান্তিনিকেতন একান্ত আমারই। তাই আমাদের শান্তিনিকেতন এত আপন, এত প্রিয়— আর একত্র হলেই গেয়ে উঠি —

আমাদের শান্তিনিকেতন, সব হতে আপন.....

ছোটবড়ো যখনই মেলামেশা করি, তখনই শান্তিনিকেতন পরিবারের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। তাই আজ ভাবছি এই শান্তিনিকেতন যখন অনেকেরই আনন্দের আশ্রয়, বিনোদনের কেন্দ্র, আর স্বাভাবিক, অকৃত্রিম প্রকৃতিকে চেনার সুযোগ বা মনের খোলা জানালা খুলে দাঁড়াবার আশ্রয়স্থল – তখন তাকে কেন তাঁর স্বাভাবিক মূল্য দিয়ে আমরা রাখি না যত্ন করে!

শান্তিনিকেতনকে কেন হতে হবে আর পাঁচটা শহুরে পাঁচমিশালি অতি আধুনিক মনোরঞ্জনের কেন্দ্রের মত ! থাকুক সে আপনমনে তার স্বাভাবিকত্ব, স্বতন্ত্রতা নিয়ে – এমনভাবেই তো দেখি তাকে, ভালোবাসে সবাইই।

কালের পরিবর্তনে তো জীবনযাত্রা বদলাচ্ছেই, বদলাবে খানিকটা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার তো একটা সীমা থাকবে। শান্তিনিকেতনের সূচনাপর্বে যেসব ঋষি-মহর্ষিজনের সাহচর্যে ভালোবাসায় গড়ে উঠেছে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই পরবর্তীকালের আশ্রমিক ও শান্তিনকেতনবাসীরই। অবশ্যই অন্যদেরও। হ্যাঁ, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু পরিবর্তন অনিবার্য, তা হচ্ছে ও হবেই কিন্তু খুবই দুঃখের কথা যখন দেখি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবনধারাটি শান্তিনিকেতন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে গুরুদেবের একটি উক্তি মনে পড়ে –

"সৃষ্টিকার্যে বৈচিত্রের প্রয়োজন আছে। এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতনকালের ভিত্তির উপরেই নতুনকালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল ছন্দে নতুনকাল তালভঙ্গ করলে সৃষ্টির সঙ্গতি রক্ষা হয় না।"

কিন্তু খুবই মনে আঘাত লাগে যখন দেখি শান্তিনিকেতনের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী, মমতাহীন, পল্লবগ্রাহী চিন্তার ব্যক্তিত্বরা শান্তিনিকেতনের ভিত্তির সঙ্গতি রক্ষাতে অসমর্থ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি তাঁরা তাঁদের সুন্দর মনের গভীরতায় অবগাহন করে তাঁদের চিন্তাকে শান্তিনিকেতনের ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই সঠিক ধারায় আনতে সমর্থ হতেন। তাহলে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও শান্তিনিকেতন তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখত।

আমাদের প্রাক্তনী তো কত কত প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, আন্তরিক বিচক্ষণ, দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গে ভরা–এরা এবং আমরা সামান্যজনেরা নিজের নিজের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে আন্তরিকভাবে কালের পরিবর্তনকে মেনে, স্বার্থচিন্তাকে দূরে রেখে "সব হাতে আপন শান্তিনিকেতন"কে কালজয়ী করতে চেষ্টা করলে তা সার্থক হবেই —এ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

আমার লেখা শেষ করার আগে আমাদের এই জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার স্থপতিজনদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আর মোহরদির শেখানো গানটি স্মরণ করি —

"পূর্বাচলের পানে তাকাই আস্থাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই, তারি লাগি আজ বাজাই বাঁশি.....
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে চেনাদিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধভোলা সেই কান্নাহাসি।"

আজ একটাই আমার প্রার্থনা— আমাদের শান্তিনিকেতন কালস্রোতের স্বাভাবিক ধাক্কা সহ্য করে নানা পরিবর্তনের মধ্যেও যেন তার সৃষ্টিলগ্নের ভিত্তিকে হারিয়ে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাণধর্মী সৃষ্টির এটাই মূলকথা। কিন্তু ভিত্তি যেন সুদৃঢ় থাকে।

রাম রহিম

পূবালিকা ভট্টাচার্য্য

সেদিনকার ঘটনাটাও আমার জীবনের অনেক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা। দিনটা ছিল ১২ই জানুয়ারী, ২০১৭। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনের পালন পর্বে আমরাও ছুটি পেয়েছিলাম। খুবই ইচ্ছা ছিল প্রতিবারের মতো এবারেও রামকৃষ্ণ মিশনের সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দেব। তা হলো না কারণ আমরা টিকিট পাইনি। আমি আত্রেয়ীদির বাড়ী থেকে গানের ক্লাস সেরে নূপুরদির বাড়ী যাব ভাবলাম। কারণ তিন দিদিকে (নূপুরদি, সিন্ধুদি ও মানুদিকে) একসাথে পাব ভেবে।

নূপুরদির বাড়ী পৌঁছে দেখলাম সিন্ধুদি নেই কিন্তু মানুদি ও মাসিমা আছেন। আমার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নূপুরদি সহজভাবেই বলা শুরু করে দিলেন আমার গান রক্ষার জন্য যে প্রয়াস চলছে তাই নিয়ে এবং এমনভাবে তার প্রশংসা করতে লাগলেন যে অন্য কারুর তার মধ্যে কিছু বলার চেষ্টা করাই বৃথা। কিন্তু নূপুরদি নিজের স্কুল জীবনের একটি ঘটনা আমাদের সাথে Share করলেন। বলছিলেন তিনি যখন ছিলেন একটি গান রচনা করেছিলেন মেয়েরা গাইবে বলে। গানের মধ্যে কোথাও 'রাম-রহিম' শব্দটি ছিল। তাতে তাঁদেরই স্কুলের কয়েকজন 'রাম-রহিম' একসাথে গানের ভাষায় থাকার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যে ব্যাপারটা নূপুরদির বিচারাধীন হয়। এবং নূপুরদি বলেছিলেন কথা দুটি বাদ দেওয়ার দরকার নেই যার যেটা উচ্চারণে অনীহা থাকবে সে জায়গায় তিনি চুপ করে থাকবেন। বিচারকের এই unparallel বিচার সকলে মেনে নেন, এবং গানটি চালু হয় Prayer- এ। ইতিমধ্যে আমারও সময় শেষ, মেয়েকে নেব, উঠতে যাচ্ছি, আবার নূপুরদির কাছ থেকে প্রশংসাবাক্য অর্জন করতে শুরু করলাম, যতই উঠতে চাই উঠতে পারি না, ওদিকে সময় কমে যাচ্ছে। নূপুরদি মানুদিকে বলছেন এই জানিস তো, পূবালিকা কিন্তু এত সব করেও গানটা ধরে রেখেছে। আত্রেয়ীর কাছে রবীন্দ্র সংগীত শেখে। আর খুব ভালো গান করে। মানুদি বলে উঠলেন ওমা তাই নাকি? এবং সাথে সাথে Order এলো নূপুরদির কাছ থেকে, "এই এক সেকেন্ড বস, দুই সেকেন্ডে গান কর।

নূপুরদি কিছু বললে সেটা আমাদের কাছে আদেশ। ফলে আমি দেখলাম কথা বাড়ালে আরও দেরী হবে। তার চেয়ে দু লাইন গান করলে সময় কম লাগবে। অতএব আমি ভীমসেন যোশী জীর একটা ভজন গাইতে লাগলাম, কারণ এই গানেই 'রাম-রহিম' একই সঙ্গে বিরাজ করেছেন।

রঘুবর তুমতো মেরী লাজ।

সদা সদা মৈঁ শারণ-তিহারী

এ্যসী তিহারো কাজ রে

রঘুবর তুমতো মেরী লাজ

অজ খন্ডন দুঃখ ভন্ডন করকে

ঐসি তিহারো কাজ

তুম তো গরীব নিবাহ রে ॥

এবং সেদিন এই গান ওই মন্দিরে বসে গাইবার সময় যে আনন্দধারা আমার দেহ, মন, প্রাণ কে জুড়িয়ে দিয়েছিলো তাতে বুঝেছিলাম 'রাম-রহিম' অভিন্ন সত্তা এবং অবিভেদ্য।